চেতনার ইশ্‌তিহার
এসো তরুণ! কাতারবদ্ধ হই
হারুন ইজহার

চেতনার ইশ্‌তিহার

এসো তরুণ!
কাতারবদ্ধ হই

মুফতি হারুন ইজহার

ই স লা মি রে নে সাঁ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ-২০১৬
দ্বিতীয় সংস্করণ-২০১৭
তৃতীয় সংস্করণ ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
চতুর্থ সংস্করণ ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রকাশক
আলপনা প্রকাশন
পরিবেশক
ইসলামিক রেনেসাঁ
প্রচ্ছদ
এস.এম. দেলোয়ার হোছাইন
মুদ্রণ:
আলপনা প্রিন্টিং হাউজ
১৬০, আল-জামেয়া মার্কেট (২য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
০১৮৮২-৯১৬০২০, ০১৮১২-১৬৫২৪০
মূল্য : ২০.০০ টাকা

চেতনার ইশ্‌তিহার

এসো তরুণ! কাতারবদ্ধ হই

যে তারুণ্য...

যে তারুণ্যের ঘুম ভাঙে মুয়াজ্জিনের আজান শুনে ...মুয়াজ্জিনের আজান শুনে যে দেশে সূর্য উঠে.. যে সবুজালয়ে ফররুখ ইসলামি রেনাসাঁর গান গেয়েছেন। যে অঞ্চলের বিস্তীর্ণ দিগন্তজুড়ে মুজাদ্দিদে আলফেসানির তাকবিরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত ছিল। যে এলাকার ধ্বংস্তুপে দাঁড়িয়ে শাহ ওলিউল্লাহ'র পরিবার পুনঃনির্মাণের শপথ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর আওয়াজ তুলেছিলেন। যে দেশের তারুণ্যের মানসপটে পূর্বসূরীদের সংগ্রামগাঁথা এখনো অবিস্মৃত। বৈশ্বিক ইসলামি জাগরণের ঢেউ যে তারুণ্যের মনকে উদ্বেলিত করে। উম্মাহর বৈচিত্রময় আন্তর্জাতিক পুনরুত্থান যে তরুণ-হৃদয়কে আন্দোলিত করে.. উমর মুখতার, সৈয়দ কুতুব, সানুসী, মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব, সৈয়দ আহমদ শহীদ, জামাল উদ্দীন আফগানি, খানজাহান, তিতুমীর প্রমুখকে যে তারুণ্য নিজের চেতনার উৎস মনে করে।

সে তারুণ্যের আজ কী হলো?

কী হলো আজ সে তারুণ্যের? তাদের একটি অংশ জীবনের বস্তুবাদে কি হারিয়ে গেলো না নিজেকে অর্থনৈতিক জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে? গণতন্ত্রের মরীচিকায় ইসলামি তারুণ্যের অগ্রবর্তী কাফেলাটিই তো পথ হারিয়ে সাহারার সীমানাহীন প্রান্তরে মুখ থুবড়ে পড়ল!

হায় আফসোস! আকাবিরদের রেখে যাওয়া দলটিও আত্মপ্রবঞ্চণার নির্বোধ শিকারে পরিণত হয়ে ঝড়ের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। আহ! আমার পূর্বসূরীদের স্থাপিত মদিনার ইসলামি শিক্ষার দুর্গগুলো কারা বৈরাগ্যবাদের উপাসনালয়ে পরিণত করল? মাহমুদুল হাসান দেওবন্দির কবরের পানে তাকিয়ে সত্যবাদী তরুণ নিভৃতে অশ্রু ঝরায়!

নদীর ওপারে ইতিহাসের এক বিশাল শিবির, যেখানে তাবু ফেলেছে লাখো তরুণ ঈমান-একিনের জয়গান শুনতে, কিন্তু কোন সে অদৃশ্য হাত! দাওয়াতের কাফেলাকে পরিণত করল মিশনারি অভিযাত্রায়? দীনে মুহাম্মদির বিশালতাকে উসুলের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ করে ইসলামি তারুণ্যের অগ্রযাত্রাকে মাঝ পথে অবরুদ্ধ করে রাখা হলো!!!

নেই কোন ভিশন!
নেই মিশন!!

তারুণ্য ইসলামের বিজয় দেখতে চায় কিন্তু এটা তার একান্ত ভিশন নয়। তাদের অনেকেই কোন না কোন ইসলামি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু এটা তাদের পরম মিশন নয়। তারুণ্য আগ্রহ রাখে। স্বপ্ন লালন করে। চেতনা পোষণ করে। একটা দর্শন সে বিশ্বাস করে। কিন্তু এগুলো তার অনুভূতির মাঝে চরম বা পরম পর্যায়ে নয়। জীবনের অন্যান্য স্বপ্নগুলোর মতো এটাও একটা। যার অগ্রাধিকার তার কাছে নেই।

মোটকথা, সমকালীন ইসলামি তারুণ্যের আবেগ আছে তবে ভিশন নেই। চেতনা আছে তবে কোন মিশন নেই। তাই লাখো তারুণ্যের স্রোতের মাঝে আমরা কোন সাহাবাওয়ালা কাফেলার হদিস পাচ্ছিনা।

তারুণ্য তুমি ঘোষণা করো,
এ সমাজ জাহিলিয়্যাতের!

হে তারুণ্য! তোমাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। সমাজে মুসলমানের আধিক্য দেখে তুমি ভাবছো, এটা মুসলিম সমাজ। সংখ্যায় যত বেশী হোক তা মুখ্য নয়, বুঝতে হবে যে, প্রচলিত সমাজব্যবস্থার কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে জাহিলিয়াতের উপর। ইসলামি তারুণ্যের দৃষ্টিভ্রমের আরেকটি কারণ হলো, সমাজে চলমান নানাবিধ ইসলামি কার্যক্রম। মসজিদ, মাদ্রাসা, তাবলীগ, খানকাহ্, ইসলামি দল, ওয়াজ মাহ্ফিল-বাহ্! বাহ্! কত সুন্দর ইসলামি সমাজ! অথচ অনুধাবন করা উচিত যে, কার্যক্রম যত বেশি হোক তা মূল উদ্দেশ্য নয়। বুঝতে হবে যে, এখানে তাগুতি ব্যবস্থার সাথে একটা সহাবস্থানের আপোষকামিতার মধ্য দিয়ে তা চলমান রয়েছে। একই স্থানে বছরে একবার যাত্রা-নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। আরেকবার আয়োজন হয় ওয়াজ মাহফিলের। একদিকে চলছে সেক্যুলার শিক্ষা কার্যক্রম আর অন্য দিকে মাদ্রাসা। কী অদৃশ্য আপোষ! দুই মেরুর কী অদ্ভুত-সহাবস্থান!!

মুসলিম সংখ্যাধিক্য এবং ইসলামের নামে ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সমাজের অবয়ব থেকে জাহিলিয়াতের কলঙ্ক মোচন করে না। তাগুতি রাজনৈতিক ও আইনব্যবস্থা এবং জাহিলিয়াতি শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো ইসলামি কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে সমাজকে ইসলামি ভাবা মানে একটা

দুঃস্বপ্ন দেখা। আজ ইসলামি মূল ধারার নেতৃত্ব যাদের হাতে তাদের একটি অংশ এহেন সমাজ বাস্তবতা তথা ইসলামের দাওয়াতি-বিপ্লবী আবেদন সম্পর্কে বে-খবর। আরেকটি অংশ চরম সুবিধাবাদী ও মুনাফিক চরিত্রের অধিকারী। সমাজ-রাষ্ট্রের জাহিলিয়াতি যাত্রা তারাই নিষ্কন্টক রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে সন্দেহাতীতভাবে। এ নেতৃত্বকে নসীহা' প্রদান ও ইস্‌লাহ' সাধন সময়ের দাবী। এখানে সংস্কার সাধিত হলে বাস্তবতা ভিন্ন দিকে মোড় নিবে ইন্‌শাআল্লাহ। অন্যথায় মুখোশ উন্মোচন করে নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করতে হবে তাদেরকে। এটি ইসলামি তারুণ্যের সামনে ভীষণ কঠিন ও নাযুকতম কাজ।

সমকালীন জাহিলিয়্যাত- সেক্যুলারিজম তথা ইউরোপীয় রেনেসাঁর চ্যালেঞ্জ

সমকালীন আধুনিক জাহিলিয়্যাতের প্রাণশক্তি ও কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ইউরোপীয় রেনেসাঁ। সামন্তবাদ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে কয়েক শত বৎসরের দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে ইউরোপে 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ' তথা 'উদারনৈতিকতাবাদ' বা 'লিবারেলিজমে'র উদ্ভব হয়। তার মূল চেতনা ছিলো 'সেক্যুলারিজম' বা ইহজাগতিকতা। ফরাসি বিপ্লবোত্তর এ লিবারেলিজম 'গণতন্ত্র' নামে একটি পরিপক্ব রাজনৈতিক দর্শন ও কাঠামো পরিগ্রহ করে। জাতীয়তাবাদ, মার্কসবাদ, পুঁজিবাদ, নারীবাদ, অবাধ স্বাধীনতা, কথিত মানবতাবাদ ইত্যাদি চিন্তাগুলো জন্ম হয় সে ইউরোপীয় রেনেসাঁর জরায়ুতে। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ সে ধারাবাহিকতারই অংশ।

যান্ত্রিক উৎকর্ষ সাধন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও শিল্প-বিপ্লব, বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রা, অভূতপূর্ব সামরিক সক্ষমতা অর্জন তথা পৃথিবীর দেশে- দেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা- এগুলো একটাও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস শক্তি নয়। বরং এসব হলো ফলাফল। তাদের শক্তির মূল উৎস হলো সে মূল্যবোধ ও আইডিয়োলোজি- ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত দীর্ঘ সামাজিক পট পরিবর্তনের মাধ্যমে রেনেসাঁর ভিতর দিয়ে যা জন্মলাভ করেছে। এটি একটি মূল্যবোধ- একটি দর্শন, একটি আদর্শ, একটি আইডিয়োলোজি, একটি জীবনব্যবস্থা, একটি চেতনা, একটি চিন্তা। যার সর্বগ্রাসী স্রোতে বিলীন হয়েছে মুসলিম উম্মাহও। উম্মাহর শিক্ষিত মহলটি আনুষ্ঠানিকতার পর্যায়ে ধর্মের সাথে সম্পর্ক রাখলেও চিন্তার জগতে নব্য "রিদ্দাহ"এর

শিকারে পরিণত হয়। মুসলিম দেশে দেশে গড়ে ওঠে সেক্যুলার দল ও প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা ও আইন পুরোটাই সেক্যুলার রঙে-ঢঙে সজ্জিত হয়। এ অঞ্চলে বৃটিশ দখলদারিত্বের মাধ্যমেই মূলত সেক্যুলারিজমের বীজ শক্ত মহীরুহে পরিণত হয়। পাশ্চাত্য রেনেসাঁর পতাকাবাহী বৃটিশকে তাড়িয়ে আমরা তদস্থলে কোন আধুনিক খেলাফত ব্যবস্থা পাইনি। আমরা যা পেয়েছি-পুঁজিবাদী পশ্চিমা আদলের রাষ্ট্রকাঠামো ও তাদেরই কাঠামো অনুযায়ী তৈরী শিক্ষা, অর্থ, আইন ও সামরিক ব্যবস্থা। কেননা বৃটিশ ও সংগ্রামের পরবর্তী সময়কালের চরিত্র যতটা ছিল আদর্শিক তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী ছিল রাজনৈতিক। প্রচন্ডবেগে প্রবহমান ইউরোপীয় রেনেসাঁর লিবারেল তথা গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ঝড়ো হাওয়ায় এমনিভাবে হারিয়ে গেল উপমহাদেশের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় প্রয়াসটিও।

পুঁজিবাদের জাহিলিয়্যাত

সামন্তবাদী জাহিলিয়্যাতের স্থান দখল করেছে পুঁজিবাদী জাহিলিয়্যাত। ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের যে লিবারেল চেতনা থেকে ভোগবাদী সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটেছে তা-ই পুঁজিবাদী শোষণের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। বর্ণবাদ পাশ্চাত্য দুনিয়ার ঘৃণ্য বস্তু হলেও পুঁজিবাদের নিষ্ঠুর অনাচারকে তারা মেনে নিয়েছে অনায়াসে। মানব দাসত্ব আধুনিক আইনে নিষিদ্ধ হলেও পুঁজিবাদ তার বুর্জুয়া লালসা পূরণে শ্রমিক নামের দাসত্বের নব সংস্করণ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে অতি বিস্তৃত আকারে এবং চরম অমানবিক কায়দায়। অর্থনৈতিক এ জাহিলিয়্যাত রাজনীতিরও নিয়ন্ত্রক। গণতন্ত্রকে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতীক মনে করা হলেও তার ভেতর আগা-গোড়ায় বিস্তার করে আছে পুঁজিবাদের অদৃশ্য হাত। সুতরাং এটা কোন স্বচ্ছ মানবিক গণতন্ত্র নয়, বরং এটি হলো পুঁজিবাদের গণতন্ত্র।

কর্পোরেট স্বার্থের নিগড় থেকে কোনভাবেই মুক্ত নয় গণমাধ্যমও। সমাজ বিধ্বংসী অপসংস্কৃতির নানা অনুশীলনের নেপথ্যেও কাজ করছে পুঁজিবাদী স্বার্থ। এ অর্থনৈতিক পুঁজিবাদী জাহিলিয়্যাত সমাজকে বিভক্ত করে রেখেছে অস্বাভাবিক শ্রেণী-সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে। আধুনিক যামানার উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্তের ক্যাটাগরি মানব সভ্যতার ইতিহাসে নিকৃষ্ট এক কলঙ্ক। এ জাহিলিয়্যাত চাপা দিয়েছে কোরআনিক অর্থব্যবস্থার অন্যতম বিধান যাকাতকে আর সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে কোরআনিক অর্থনীতির নিষিদ্ধ বিধান সুদকে। সামাজিকতা বিবর্জিত

বাহ্যিক ধার্মিকতা এ জাহিলিয়্যাতের পথ চলা আরো সহজ করে দিয়েছে। মুসলিম সমাজে নফল হজ্ব ও ওমরার হুড়োহুড়ি থাকলেও যাকাতের ফরজ বিধানকে এড়িয়ে চলা হচ্ছে সচেতন ভাবে। অর্থনীতি কোন নীতিবিজ্ঞান নয়- একথা প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক অর্থনীতি তার নিজের জাহিলিয়্যাত নিজেই ঘোষণা করেছে কোন রাখঢাক ছাড়াই। মার্কসবাদ মানব জাতির এ মৌলিক সংকট সমাধানে গোড়ায় হাত দিলেও জড়বাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা এবং শ্রেণী সংগ্রামের উপর অতিমাত্রার জোর দিতে গিয়ে পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লব সফল করতে পারেনি। তা বরং জন্ম দিয়েছে সোস্যালিজম নামের আরেক জাহিলিয়্যাত।

সেকুল্যার শিক্ষা নব্য
জাহিলিয়্যাতের প্রধান ফটক

সভ্যতার চড়াই-উতরাইয়ের দীর্ঘমেয়াদি নানা ধরনের পট পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকতার ভেতর থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের মূল্যমান গড়ে ওঠে। লিবারেলিজমের রেনেসাঁ-প্রসূত মূল্যমান- যাকে সাম্য-মৈত্রী, স্বাধীনতা তথা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে ব্যাখ্যা করে প্রচার করা হয়, তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা। সুতরাং এ শিক্ষাব্যবস্থা রেনেসাঁর গর্ভে জন্ম নেওয়া সে উদারনৈতিকতাবাদের সেকুল্যার বস্তুবাদ ও পুঁজিবাদী ভোগবাদের চেতনা থেকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা। যে শিক্ষায় নৈতিকতার বিষয়টি গৌণ, যেখানে মানবের কতক প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা হলেও আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি সমূহের সন্তোষজনক বিধানের ফরমুলা নেই, যেখানে বিজ্ঞানের মহত্ত্ব বয়ান করা হলেও তার নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক (যেমনঃ অস্ত্র,শিল্প ও বিলাস পণ্য) দিকটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয় সে শিক্ষায় মানবের প্রকৃত কল্যাণ বলতে যা বুঝায় তা যে অনুপস্থিত- এটা পশ্চিমা সভ্যতার পতনমুখী আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে উপলব্ধি করা যায়।

যদি বলা হয় মুসলিমবিশ্বে সেক্যুলার চেতনা প্রসারে সবচে' কার্যকর অস্ত্র কোনটি? তবে সন্দেহাতীতভাবে বলতে হবে, তা হলো আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা।

লিবারেল মুখোশে নবরূপে

ক্রুসেড ও সাম্রাজ্যবাদ

ইউরোপের রেনেসাঁ যে লিবারেলিজম'র মন্ত্রণা দিয়ে উজ্জীবিত করেছে, তা কি ইংরেজদের ক্রুসেডের চেতনা ও সাম্রাজ্যবাদের অভিপ্রায়কে বিংশ শতাব্দীতে অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়েছিলো? তার উত্তর হলো- না। সন্দেহ নেই যে, আধুনিক ইউরোপ সেক্যুলার নীতির কারণে তার ধর্মীয় ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রিফরমেশন ও রেনেসাঁর মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ সমাজকে পোপতন্ত্রের নিগড় থেকে মুক্ত করলেও মুসলিম উম্মাহর ক্ষেত্রে ইংরেজ ক্রুসেডের চেতনা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেনি। আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক ইউরোপের উত্থানকে বস্তুবাদী শৌর্য-বীর্য দ্বারা বিচার করা গেলেও মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাদের কট্টরবাদী খ্রিস্টিয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়নি এতটুকুও। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াসটি হলো, 'অরিয়েন্টেলিজম' বা প্রাচ্যবিদ্যার মাধ্যমে ইসলামী ইতিহাসের সুরম্য প্রাসাদকে ক্ষত-বিক্ষত করার প্রয়াস।

মধ্যপ্রাচ্যের পশ্চিমা নীতি তেল ও অর্থনীতির স্বার্থ দ্বারাই কেবল নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং ইসরাইলের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে অঞ্চলের আসন্ন ধর্মীয় সংঘাতে ইহুদী খ্রিষ্টানদের প্রভাব-বলয় গড়ে তোলাও তাদের অন্যতম মিশনের অংশ।

ক্রুসেডের পর এবার আসা যাক সাম্রাজ্যবাদের কথায়। সাম্রাজ্যবাদ তার দৃশ্যমান কায়িক মহড়া থেকে প্রস্থান করলেও তার প্রেতাত্মা স্বাধীন ভূখন্ডে রেখে যাওয়া একটি পূর্ণাঙ্গ আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোর মাধ্যমে নিজের অবস্থান জানান দিয়ে যাচ্ছে। লিবারেল প্রগতির বড়ি সেবন করিয়ে স্বাধীন জনতাকে অবচেতনে সাম্রাজ্যবাদের নব সংস্করণ দ্বারা এক অদৃশ্য শিকলের বেড়াজালে বন্দি করে ফেলা হয়েছে। 'সামন্তবাদ' মার্কা সনাতন সাম্রাজ্যবাদকে মানুষ ঘৃণা করলেও নব্য সাম্রাজ্যবাদের মুখরোচক গল্পে স্বকীয়তা বিসর্জন দানে সে বড়ই তৃপ্তি অনুভব করছে।

বাঙালি উগ্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ:
মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা

ইত্যবসরে বাঙালী মুসলমানদের জন্য "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" এর অতিরিক্ত বিভীষিকা নিয়ে যা আসে, তা হলো এ অঞ্চলের সেক্যুলার গোষ্ঠী কর্তৃক বাংলা সংস্কৃতিকে ছিনতাই করে তার উপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নামে ইসলামকে বাংলা সংস্কৃতি থেকে নির্বাসিত করা হলেও পৌত্তলিকতার আবর্জনা তারা সাগ্রহে গ্রহণ করে নেয়। ইউরোপীয় লিবারেলিজম, বাংলা সংস্কৃতি, পৌত্তলিকতা, কমিউনিজম ও সুফীবাদের মিলিত উপাদান দ্বারা বাংলার আবহে জন্ম নেয় এক পাঁচমিশালী সেক্যুলারিজম। ফলে বাংলা সাহিত্যের মূলধারা এ পাঁচমিশালি সেক্যুলারিজম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের এ সেক্যুলার শ্রেণীটি না হতে পেরেছে পুরো পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ইউরোপিয়ান। না হতে পেরেছে পুরো সাম্যবাদী কমিউনিস্ট- না পেরেছে পৌত্তলিক হিন্দু হতে- না সঠিক মুসলমান- না পেরেছে পূর্ণাঙ্গ ঐতিহ্যবাদী বাঙালি হতে। এমন নড়বড়ে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর আজ বিজয়ী। কেননা তারা একটা বিষয়ে সফল হয়েছে, তা হলো- মধ্য ও নিম্নবিত্ত বাঙালি একটি শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে ইসলামোফোবিয়া সৃষ্টি ।

যে বিষয়টি এখানে প্রণিধানযোগ্য, তা হলো বাংলাদেশের সেক্যুলারিজম খোদ্ এ শব্দটি ব্যবহারে ভয় পায়। এজন্য তারা প্রগতিশীলতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির মুখোশ ধারণ করে আছে। বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মূল প্রবাহকে আলোকিত চিন্তা দ্বারা নয়, বরং স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে ইসলামের বিপক্ষে দাঁড় করানো হয়। বাংলা সাহিত্যে ইসলামপন্থীদের অনগ্রসরতা তাদেরকে এ সুযোগ এনে দেয়। এ অঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার আতঙ্ক থেকে বাঙালি সেক্যুলারিজম নিজেকে আক্রমণের ভূমিকায় শাণিত রেখেছে আগে থেকেই। কেননা স্বভাবত ক্ষুদ্র শ্রেণী সবসময় সংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে থাকার জন্য প্রয়াসী হয়।

সামাজিক জাহিলিয়াতঃ
যার জন্মস্থান মুসলমানের সেক্যুলার মনস্তত্ত্ব

পশ্চিমা সভ্যতার বৈশ্বিক জাহিলিয়্যাতের ন্যায় পুরোটাই আমদানিকৃত কিংবা অনুপ্রবেশকারী নয় এ জাহিলিয়্যাত। সামাজিক এ জাহিলিয়্যাত আঞ্চলিক বাঙালি ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ন্যায় পুরোটাই জোরপূর্বক আরোপিত নয়। এ জাহিলিয়্যাত আভ্যন্তরীণ এমন এক উপসর্গ যার জন্মস্থান হলো বাঙালি মুসলমানদের সুপ্ত সেক্যুলার মনস্তত্ত্ব। স্থানীয় ও বৈশ্বিক পারিপার্শ্বিকতা হয়তো এ উপসর্গকে আরো বিস্তৃত, গভীর ও স্থায়ী করেছে। ধর্মকে কেবলই আনুষ্ঠানকিতা ঠাওর করার হিন্দুয়ানী, খ্রিস্টানি আধ্যাত্মিক মনের সাথে সমাজের মুসলমানদের এক বিরাট অংশের মনের কোন পার্থক্য নেই। কবরপূজার সাথে মূর্তিপূজা, এবং ভন্ড পীরতন্ত্রের সাথে পোপবাদের সাদৃশ্য আমাদেরকে তা-ই মনে করিয়ে দেয়। আজ কারবালার অশ্রুজলে ভেসে গেছে ইসলামের আবির্ভাব কালের অমর সংগ্রামের ঐতিহাসিক অক্ষরগুলো। ওরসের জৌলুসে হারিয়ে গেছে সাহাবাদের রক্তস্নাত দাওয়াতি আখ্যান।পীর-মুরিদির বাইআত ভুলিয়ে দিয়েছে খেলাফতের বাইআত, সুন্নাত সমূহের স্থান দখল করেছে নানান তরিকা ও অজিফার যোগ ব্যায়াম।

অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে মনোজগতের সুপ্ত জায়গায় জন্মেছে অঘোষিত এ সেক্যুলার জাহিলিয়াত, যা জন্ম দিয়েছে ধর্মের নামে অধর্ম চর্চার (বিদআত-শিরক) সংস্কৃতি। পাশাপাশি জন্ম দিয়েছে ভোগবাদী সংস্কৃতির, যেখানে মুসলমানিত্বের পরিচয় অক্ষুণ্ন রেখেই মুসলিম সমাজ অবলীলায় সাড়া দিচ্ছে স্বভাবজাত কুপ্রবৃত্তিগুলোর নগ্ন ডাকে। মুসলিম সমাজে অপসংস্কৃতির এ জাহিলিয়্যাত তার সরব উপস্থিতি জানান দিচ্ছে অগণিত পন্থায়। অশ্লীল নাট্যদৃশ্যের পর্দায়, হিন্দি গানের মূর্ছনায়, ভ্যালেন্টাইন ডে'র বেলাল্লাপনায়, 'থার্টি ফাস্ট নাইট'র উন্মাদনায়, বৈশাখী মঙ্গলযাত্রায়, কনসার্টের উত্তাল তরঙ্গমালায়, কর্মস্থলে শিক্ষালয়ে অবাধ জেন্ডার মেলামেশায়, লিভ টুগেদারে, মাদকের নেশায়, জুয়ার আসরে, লাইসেন্সধারী যৌনকর্মীদের আস্তানায়, বিনোদনের বাহারি আয়োজনে, পর্যটনে, ক্রীড়াঙ্গনে, যাত্রায়, মেলায়। ধস নামানো নৈতিকতার এহেন অবক্ষয়েও নাকি অক্ষয় থেকে যাচ্ছে হাজি সাহেবের মুসলমানিত্ব!

ইসলামি পুনর্জাগরণ–পাল্টা চ্যালেঞ্জ

বিশ শতকের গোড়ার দিকেই ইসলামি জাগরণের হাওয়া বইতে শুরু করে। তুর্কি খেলাফতের পতনের শোক পুনর্জাগরণের চেতনাকে শাণিত করে তোলে। ইসলামি তারুণ্যের হৃদয়ে আশার নতুন প্রভাত ফুটে ওঠে। ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দার্শনিক ভাষায় আঘাত হানা শুরু হয়। কয়েক দশকের মধ্যেই গড়ে ওঠে বিশাল আধুনিক ইসলামি চিন্তা ও সাহিত্যকর্ম। জন্ম নেয় ইসলামি তারুণ্যের দাওয়াতি কাফেলা ও রাজনৈতিক প্লাটফর্ম। মসজিদের মিম্বর থেকে শুরু করে সেমিনার হল এবং পর্যায়ক্রমে রাজপথ এমনকি রাজপ্রাসাদে ধ্বনিত হয় ইসলামি জাগরণের আযান। গর্জে ওঠে ইসলামের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণের আওয়াজ। মুসলিম দেশে দেশে সেক্যুলারিজম সামাজিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। আধুনিক প্রজন্মের কাছে দুটি পথই উন্মুক্ত হয়, ইউরোপীয় রেনেসাঁ এবং তার পাশাপাশি ইসলামি নবজাগরণের রাস্তা। মুসলিম বিশ্বের আকাশ বাতাস গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রের ধ্বনি এবং অন্যদিকে ইসলামি বিপ্লবের পাল্টা ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। ইউরোপ যে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রেনেসাঁর জন্ম দেয়, সে ইউরোপ আতঙ্কিত হয়ে ঐ স্বৈরতন্ত্রকেই ব্যবহার করে ইসলামি জাগরণের বিরুদ্ধে। যে আধুনিক শিক্ষালয়কে তারা এশিয়ান ইংরেজ তৈরির কারখানা রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলো সেখান থেকেই বেরিয়ে আসতে শুরু হলো ইসলামি আন্দোলনের সু-শিক্ষিত কর্মীবাহিনী। ইসলামি পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন ইউরোপীয় সভ্যতার দুর্বলতাগুলো বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা উন্মোচিত করে। যার কোন সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হয় ইউরোপ। এ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো, আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভ বক্তব্য ও শাণিত যুক্তিকে আত্মরক্ষার স্থলে পাল্টা আঘাতে চমৎকারভাবে ব্যবহার। ইসলামি পুনর্জাগরণ ইউরোপকে বেশি প্রভাবিত করতে না পারলেও নগদ যে ফলাফলটি তার ঝুড়িতে তুলে নিতে সক্ষম হয়েছে তা হলো- মুসলিম সমাজ ও তারুণ্যের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার। বিশাল ইসলামি চিন্তা ও সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে উত্থান ঘটে এক দল ইসলামি গবেষক ও চিন্তা নায়কের; যাদের ক্ষুরধার বিশেস্নষণ পশ্চিমা সভ্যতার তাত্ত্বিক ভিত্তিকে কাপিয়ে দেয়। বৈপ্লবিক ইসলামি দাওয়াতের বাতিঘর হিসেবে অভ্যুদয় ঘটে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের। আর উপমহাদেশে পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে মাইল ফলক রচিত

হয় ইসলামি রাজনীতির। ইসলামি পুনর্জাগরণ শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক বা রাজনৈতিক ভূমিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। দাওয়াত ও ইসলামি শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে তা সামাজিকভাবেও চেতনার দাবানল ছড়িয়ে দেয়। 'দেওবন্দ আন্দোলন' পুরো উপমহাদেশে তথা আশেপাশের অঞ্চল গুলোতে মাদ্রাসার নামে গড়ে তুলে অপ্রতিরোধ্য সামাজিক ইসলামি দুর্গ। তাবলীগ জামাত ছিলো দেওবন্দ আন্দোলনের আরেক ডানা। যার কর্মছায়ায় সমবেত সারা বিশ্বের মুসলমান। প্রাথমিক ইসলামি শিক্ষার প্রসারে ইতিহাসে এতবড় তৎপরতার নজির নেই। ইসলামি পুনর্জাগরণ আগ্রাসন ও দখলদারিত্বের বিরূদ্ধে জিহাদ আন্দোলন সূচনার মাধ্যমে এক নতুন ফ্রন্টে নিজেদের জানান দেয়। ইসলামি আন্দোলনে জিহাদের ভূমিকা সংশ্লিষ্ট হওয়ায় বিশ্ব রাজনীতির কূটনৈতিক অঙ্গনে আমূল পরিবর্তন ঘটে। পুঁজিবাদী বিশ্বশক্তির মোকাবেলায় নতুন মেরুকরণে সমাজতন্ত্রের জায়গা দখল করে ইসলাম। সন্ত্রাসবাদের প্রপাগান্ডা চালিয়েও জিহাদি দাবানলকে শান্ত করা যাচ্ছে না। কেননা শোষণ ও দখলদারিত্বের প্রতিক্রিয়ায় জনগণের ভেতর থেকেই এ আন্দোলনের উন্মেষ। পক্ষান্তরে কিছু ক্ষেত্রে জিহাদি কার্যক্রম ব্যর্থতার সাক্ষর রাখছে। কেননা তা জনগণের কাতারের বাহিরে থেকে পরিচালিত এবং দাওয়াতের বৈপ্লবিক ধারাবাহিকতাকে পাশ কাটিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে করা হয়।

শিক্ষা ও অর্থনীতির মত জটিল বিষয়গুলো বাদ পড়েনি ইসলামি পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনের এজেন্ডা থেকে। ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক বক্তব্যের সমন্বয়ে গঠিত হয় নতুন ইসলামি সিলেবাস ও শিক্ষাব্যবস্থা। ইসলামি অর্থব্যবস্থা পশ্চিমা বিশ্বের জন্য সৃষ্টি করে চমক।

তরুণ! তুমি চিহ্নিত করো ব্যর্থতার অন্তর্নিহিত কারণগুলো

দাওয়াত বিবর্জিত রাজনীতি

পরিবর্তিত সময়ের আবহে ইসলামি পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন শত-নিষ্ঠা সত্ত্বেও কিছু উপসর্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সমাজকে টার্গেট না করে রাষ্ট্রশক্তিকে প্রধান লক্ষ্যে পরিণত করা হয়। দাওয়াতি কাফেলা পরিণত হয় নিছক রাজনৈতিক প্লাটফর্মে। আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভির মত বস্তুনিষ্ঠ গবেষকগণ ইখওয়ানুল মুসলিমীন সম্পর্কে যে পর্যবেক্ষণ ব্যক্ত করেছেন। তাতে তাঁরা মনে করেন দাওয়াত বিমুখতা

এবং প্রস্তুতির পূর্বে রাজনৈতিক ময়দানে অবতীর্ণ হওয়াটাই ইসলামি আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ। অবশ্য সেক্যুলার রাষ্ট্রযন্ত্র যে দাওয়াতি কাজেও চরম বৈপরীত্য প্রদর্শন করেনি তা নয়। ইসলামি আন্দোলন নির্বাচনমুখী গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চাকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বাহন মনে করে বিপ্লবের মহান লক্ষ্য থেকে ছিটকে পড়ে গতানুগতিক রাজনীতির গর্ভে নিজেকে বিলীন করে ফেলে।

রাজনৈতিক কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার তাগাদা থেকে জাহিলিয়াতের রাজনৈতিক, সামাজিক কাঠামোর সাথে আপোষের পথ বেছে নিতে হয়েছে ইসলামি আন্দোলনকে। ইক্বামতে দ্বীনের লক্ষ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সীরাতে দাওয়াতে দ্বীনের যে পদ্ধতি রেখে গেছেন তা ইসলামি আন্দোলনের সমকালীন অনুশীলনে আধুনিক নিয়মনীতির মধ্যে হারিয়ে যায়।

ইসলামি আন্দোলন কর্তৃক পাশ্চাত্যের আদলে দল গঠন এবং সে আদলে কর্মসূচি প্রণয়নের দ্বারা সেক্যুলার স্টাবলিস্টমেন্ট একটি রাজনৈতিক হুমকি অনুভব করে যা তাদের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করবে। ইসলামি আন্দোলন এমন বার্তা দিতে পারেনি যে, আমরা ক্ষমতার মসনদ দখল করতে চাই না বরং সেটা সংস্কার করতে চাই। দাওয়াতের এ সরল উদারতার স্থলে প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিক জটিল বার্তা দেয়া হয়েছে। ইসলাম বনাম তাগুতের দ্বন্দ্ব পরিণত হলো ইসলামি দল ও সেক্যুলার দলের রাজনৈতিক লড়াই-এ।

লড়াইয়ের মেরুকরণে আদর্শের স্থলে রাজনীতি

সংকটের মূল জায়গা চিহ্নিত করার স্থলে তার বাহ্যিক অবয়বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে ইসলামি আন্দোলন অর্থাৎ সেক্যুলারিজমের আদর্শিক ভিত্তির উপর আঘাত না করে তাঁর যে রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ বা অবয়ব সেটাকেই লক্ষবস্তুতে পরিণত করা হলো। এমনিভাবে একটি আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করা হলো আদর্শিক লক্ষ বিবর্জিত রাজনৈতিক হাতিয়ার দ্বারা। সেক্যুলার দলকে টার্গেট করা হলো সেক্যুলার আদর্শকে টার্গেট না করে। শত্রুশিবিরের মূল ফ্রন্ট চিহ্নিত না করে সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়া হয়। প্রজ্ঞাহীন এ স্থূল সিদ্ধান্তের দরুন দীর্ঘ সংগ্রাম ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের শক্তি অক্ষুণ্ন থেকে যায়। রাজনৈতিক লড়াইয়ের আড়ালে সেক্যুলারিজমের অদৃশ্য দানব সুরক্ষিত রয়ে গেল। নিশ্চয়

রাজনীতির ময়দানে আদর্শিক সংঘাতের ফয়সালা হয়, কিন্তু প্রস্তুতিহীন লড়াই কিংবা লক্ষ্য ভ্রষ্ট যাত্রা আত্মহত্যার শামিল।

ইসলামি আন্দোলন নিজেকে ইসলামি আন্দোলন বলার চেয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলার মধ্যে বেশি মাত্রায় পুলক অনুভব করতে লাগল। প্রতিপক্ষকে তাদের আসল আদর্শিক নামে ডাকার স্থলে রাজনৈতিকভাবে সম্বোধন করা হলো। কেন এমনটা হলো? ইসলামি পুণর্জাগরণের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আন্দোলন গত শতাব্দীর শেষার্ধে ব্যাপকতা লাভ করলে পশ্চিমা মিডিয়া তার উপর মৌলবাদের তকমা লাগিয়ে দেয়। এ প্রচারণা এতোই প্রবল ছিল যে, এক পর্যায়ে ইসলামি আন্দোলনের একটি বড় অংশ হীনমন্যতার শিকার হয়ে আত্মরক্ষার কৌশল গ্রহণ করে। সেক্যুলারদের অপবাদ থেকে রক্ষার জন্য গণতন্ত্রের লেবাস পরিয়ে দেয়া হয় ইসলামি আন্দোলনের গায়ে। সাময়িক এ কৌশলটি পরবর্তীতে আন্দোলনের মূল স্রোতে মিশে চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়। অদূর অতীতে আদর্শচ্যুতির সবচেয়ে বড় নজির সম্ভবত মুসলিমলীগ কর্তৃক পাকিস্তান আন্দোলন, যার পিছনে ইসলামি জাতীয়তাবাদের আদর্শিক চেতনার স্থলে মুসলিম জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক কনসেপ্টটাই সক্রিয় ছিল, যার মাশুল দিতে হয়েছে পাকিস্তানিদের, বাঙালিদের এবং মুসলিম বিশ্বকেও।

পুনর্জাগরণের দু'প্রজন্মের পার্থক্য

আমরা ইসলামি পুনর্জাগরণের অগ্রবর্তীদল এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে পরিস্কার পার্থক্য লক্ষ্য করলাম। আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা অগ্রবর্তী দল ছিল আপোষহীন এবং শাণিত বক্তব্যে আক্রমণের ভূমিকায়। আর পরবর্তী প্রজন্ম হয়ে উঠে কৌশলের নামে আপোষকামী এবং আত্মরক্ষার ভূমিকায় অভিনয়কারী। অগ্রবর্তী দলটির ভাষা ছিল খালেছ দাওয়াতি এবং সম্পূর্ণরূপে আদর্শিক, আর পরবর্তী প্রজন্ম গ্রহণ করে রাজনীতি ও গণতন্ত্রের ভাষা। পূর্ববর্তীদল নিজেদেরকে মুক্ত ও স্বাধীন এবং প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্যের উর্ধ্বে রেখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের ইসলামি আন্দোলনের একটা বড় অংশই নানা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। হয়ত তারা এটাকেও দাওয়াতের অংশ মনে করেছিলেন। কিন্তু এহেন সামাজিক কাঠামোর মধ্যে তারা যে হারিয়েও যেতে পারেন- এ আশংকা তারা মাথায় রাখেন নি। একেবারে

মূল কথাটি আসলে বলে দেয়া দরকার, তা হলো ইসলামি আন্দোলনের অগ্রবর্তী কাফেলাটি ছিল নেফাকের উর্ধ্বে, বস্তুবাদী জীবনবিমুখ, প্রচন্ডভাবে তাক্ওয়ার অধিকারী এবং জ্ঞান চর্চায় গভীর মনোনিবেশকারী, আর পরবর্তী প্রজন্ম এসবগুলোতে পরিচয় দেয় ব্যর্থতার।

বিপ্লবী চেতনা বিবর্জিত দাওয়াত

ইসলামি আন্দোলনের রাজনৈতিক ধারা যেমনিভাবে দাওয়াতের আবেদন হারিয়ে ফেলে অন্যদিকে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও তাবলিগ সংশিস্নষ্ট ইসলামি আন্দোলনের দাওয়াতি ধারাটি ইসলামের বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ও রাজনৈতিক চেতনা এড়িয়ে চলার নীতি গ্রহণ করে বসে। দাওয়াতি ধারার অভিযাত্রীগণ সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাক্তি পর্যায়ে ইসলামি মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রয়াসে ব্যাপক সফলতার সাক্ষর রাখলেও সামষ্টিক পর্যায়ে তারা উম্মাহর সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কোন ধারণা প্রচারে ভূমিকা রাখেনি। জাহিলিয়াতের আঁধার ও তাগুতের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করতে বড় ধরনের ব্যর্থতার পরিচয় দেয় তারা। সিরাতে রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিপরীত এক ধরনের সুফিবাদি মানসিকতা যা ইসলামি ব্যক্তিত্ত্বদের মনস্তত্ত্বের গভীরে জেঁকে বসেছিল, তা-ই এহেন পরিস্থিতির জন্য দায়ী। পাকিস্তান আন্দোলনকে হাতের নাগালে পেয়েও দেওবন্দি বুজুর্গগণ সরলীকরণের মাধ্যমে মুনাফিকদের হাতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে মাদ্‌রাসা ও খানকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যান। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্ব গ্রহণের ব্যাপারে ব্যক্তিগত অনীহা একটি মহৎগুণ এবং ইসলামের মহান শিক্ষাও বটে। কিন্তু ইসলামি আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে ঐ ব্যক্তিগত চরিত্রের মাপকাঠিতে বিচার করা চলবে না। ইসলামি শিক্ষা ও দাওয়াতি ধারা সংশিস্নষ্টগণ দুটো বিষয়কে একাকার করেই ভুলটা করেছেন। ইসলামি শিক্ষা বর্তমান শতকের বিশাল এক পুনর্জাগরণ। কিন্তু সময়ের আবহে এটাই দৃশ্যমান হলো যে, প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ সাধন ও ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়নেই যেন এতদসংশিস্নষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়ে পড়ে অবচেতনে। এ উন্নয়নের জোয়ারে হারিয়ে গেল বৈপ্লবিক দাওয়াতের মানসিকতা। দেওবন্দের (চার) মূলনীতির কথা এখন কওমী মাদ্‌রাসার কম ছাত্রই জানে। আর ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অল্প যারা বেরিয়ে আসছেন তারা হয়ত ইসলামি

স্কলার। তবে দ্বীনের দাঈ নন। প্রচলিত ইসলামি শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে দাওয়াতে দ্বীনের আংশিক সন্তোষ বিধান হচ্ছে। কিন্তু ইসলামের রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক ব্যাপারটি এখানে বরাবরেই উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

বর্তমানে ইসলামি শিক্ষা ও দাওয়াতি কার্যক্রম জাহিলিয়াতি সমাজব্যবস্থাকে মেনে নিয়েই চলমান রয়েছে। একথা এখন বিস্মৃত হয়ে গেছে যে, প্রচলিত ইসলামি শিক্ষা ও দাওয়াতি তৎপরতা ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার অবর্তমানে বিকল্প পন্থা হিসেবে আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে, যা মূলত বাস্তবায়ন হচ্ছে সামাজিক উদ্যোগেই। এটা কখনো স্থায়ী পদ্ধতি হতে পারে না। শিক্ষা ও দাওয়াতি তৎপরতার সঙ্গে সংশিস্নষ্টগণ এ বাস্তবতা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন যে, যে কাজ তাঁরা সম্পাদন করছেন তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটি গুরু দ্বীনি দায়িত্ব ও মহাপুণ্যবান কাজ হলেও তাঁর সংঘবদ্ধ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়নের মূল দায়িত্ব কিন্তু রাষ্ট্রের, এবং কাঙ্খিত চাহিদা মেটানোর পর্যায়ে নিয়ে এ কাজের পূর্ণতা দান একমাত্র রাষ্ট্রীয় অবস্থান থেকেই সম্ভব। মোটকথা রাষ্ট্র ব্যতিত কোনদিন দাওয়াত ও তালিম ইত্যাদি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে না। মানের দিক দিয়েও না, সংখ্যা ও গণনা হিসেবেও না। সুতরাং এটা পরিস্কার যে, সব বাদ দিয়ে যদি দাওয়াত ও ইসলামি শিক্ষার স্বার্থের কথা চিন্তা করা হয়, তবুও রাজনৈতিক উদ্যোগের কোন বিকল্প নেই।

চর্চায়
খণ্ডিত ইসলাম

কোথাও দাওয়াতের (তাও সংকীর্ণ অর্থে) অনুশীলন- কোথাও শিক্ষার তাগাদা- কোথাও আধ্যাত্মিক কসরৎ- কোথাও আবার জিহাদের জয়গান- কোথাও রাজনৈতিক চর্চা। ফলাফল দাড়ালো রকমারী মুসলমানের আবির্ভাব। জিহাদি মুসলমান, তাবলিগি মুসলমান, সুফিবাদি মুসলমান, সংস্কৃতিমনা মুসলমান, বিপ্লবী মুসলমান। এ রকমারিত্ব ও বৈচিত্র সমস্যাতো নয়ই, বরং ইসলামের উৎকর্ষতার প্রতীক, ইসলামের ব্যাপকতা ও বিশালতার প্রতিচ্ছবি, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো,এ সবগুলো একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন। পরস্পরের সম্পূরক নয়। এগুলো একই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়। বরং টুকরো হওয়া অংশ বিশেষ, যেগুলো এক মন থেকে নিয়ন্ত্রিত নয়, এবং একই চেতনা থেকে উৎসারিত নয়। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাসমূহ সজীব থাকে একই উৎস থেকে প্রাণ আহরণ করে। জোয়ার-ভাটায় সরব নদ-

নহরগুলোর স্পন্দনের কেন্দ্রবিন্দু একই স্থান থেকে। আর খণ্ডিত ইসলামের অনুসারীরা তার বিপরীত পরস্পরের প্রতিপক্ষ। শুধুই কি খণ্ডিত? বরং খণ্ডিত চর্চার স্বাভাবিক ফল দাঁড়ালো বিকৃত অনুশীলন- দাওয়াত বিবর্জিত রাজনীতি, রাজনীতি বিবর্জিত দাওয়াত, ইসলামি জ্ঞান ও শিক্ষা বিবর্জিত আধ্যাত্মিকতাবাদ, আধ্যাত্মিকতাবাদ বিবর্জিত ইসলামি শিক্ষা, জিহাদ-বিবর্জিত দাওয়াত, দাওয়াত বিবর্জিত জিহাদ। এ হলো, সমকালীন ইসলামি তৎপরতা সমূহের অন্তর্নিহিত চিত্র। কৌশলগত ও সামর্থ্যগত সীমাবদ্ধতাকে এখানে ওযর-আপত্তি হিসেবে উত্থাপন করা যায় না। কেননা এটা নিজস্ব তৈরী এমন এক সংকট, যা অবচেতনে দর্শন ও চিন্তার জায়গাতেই বিরাজ করছে। ইসলামের খণ্ডিত চর্চাই যে ইসলাম বিকৃতির পথকে নিষ্কন্টক করেছে, তা গণতন্ত্রের বিষবাষ্পে মিশ্রিত ইসলামি রাজনীতি থেকে বুঝা যায়। তা বুঝা যায় বৈরাগ্যবাদে আক্রান্ত ইসলামি শিক্ষা ও দাওয়াত থেকে। তা বুঝা যায় ভ্রান্ত সুফি ইজমের ভাইরাসে আক্রান্ত খানকাহ গুলোর কাজ থেকে। তা বুঝা যায় তাকওয়া বিবর্জিত ইসলামি সংস্কৃতি চর্চা থেকে।

ইসলামি তারুণ্য আরো হোঁচট খেলো। ইসলামের খন্ডিত ধারণা আর বিকৃত চর্চা, তারপর সে শিকার হলো সংগঠনের নামে দলবাজির জাহিলিয়্যাতের। এভাবে নানা প্লাটফর্ম ও দলে উপদলে বিভক্ত হলো উম্মাহ, ঐক্যের বন্ধন হয়ে গেলো টুকরো। ইসলামের সামগ্রিক ও ব্যাপকভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে ইসলামি তারুণ্য আগে থেকেই বিভক্ত ছিলো। মনস্তাত্ত্বিক সংকীর্ণতা থেকে জন্ম নেয়া দলবাজি সে বিভক্তিকে আরো তীব্রতর করলো।

আত্মরক্ষামূলক অবস্থান

জিহাদ ব্যতীত সমকালীন ইসলামি আন্দোলনের সবকটি ধারায় আত্মরক্ষামূলক অবস্থান ও কৌশলের আশ্রয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এটিও আন্দোলনের ব্যর্থতার একটি কারণ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ কোন নবী-রাসুলদের দাওয়াতি সংগ্রামে এমন আত্মরক্ষামূলক ভাষা গ্রহণের নজির নেই। শত প্রতিকূলতা ও জীবননাশক হুমকি সত্ত্বেও তারা শিরিকের বিরুদ্ধে আপোষহীন ভাষা ব্যবহার করে গেছেন।অন্য দিকে শত্রুপক্ষের বক্তব্য কিন্তু ঠিকই

আক্রমণাত্মক ও শানিত। তারা মিথ্যার উপর দাঁড়িয়েও আক্রমণের ভূমিকায় রয়েছে। আর আমরা সত্যের উপর থেকেও আত্মরক্ষার কসরত সাধন করছি। আজ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দোসর গণতন্ত্রও মানবাধিকারের বুলি আওড়াচ্ছে দৃপ্তকণ্ঠে। বাঙালি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মিথ্যাচারের অব্যাহত আস্ফালন দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছে মুক্তিযুদ্ধের সেক্যুলার চেতনা ও কথিত অসাম্প্রদায়িকতার মত পরিভাষা এবং 'আগে বাঙালি পরে মুসলমান' এর মত আত্মঘাতী চিন্তাধারা- নারীবাদী দেশের মহিলা সমাজের ত্রাণকর্তা সেজে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে সম-অধিকারের শ্লোগান।

আমরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী বলে আখ্যায়িত করার আগেই তারা আমাদেরকে মৌলবাদী বলে প্রচারণা চালিয়ে দিলো-আমরা "খেলাফত" বলার আগেই তারা বলে ফেললো 'গণতন্ত্র'- আমরা তাদেরকে উগ্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বলার আগেই তারা আমাদেরকে আখ্যায়িত করলো প্রতিক্রিয়াশীল- তাদেরকে আমরা সেক্যুলার বলার আগেই আমাদের বিরুদ্ধে তারা প্রচারণা শুরু করলো ধর্মান্ধ ধর্মান্ধ বলে- তাদেরকে আমরা পৌত্তলিকতার দোসর বলার আগেই তারা আমাদের বিরুদ্ধে রাজাকারের লকব দিয়ে দিলো। আমরা তাদেরকে নাস্তিক বলে মুখোশ উন্মোচন করার পূর্বেই তারা আমাদেরকে জঙ্গি জঙ্গি রব তুলে বসলো- আমরা পারিবারিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তোলার আগেই তারা নারী স্বাধীনতার শ্লোগান নিয়ে গর্জে উঠলো- আমরা মুসলিম শরীয়াহ্ পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠার কল্পনা করার আগেই তারা নারী উন্নয়ন নীতিমালার পরিকল্পনা হাতে নিয়ে বসল- আমরা সংবিধান ও আইনকে ইসলামের সাথে সমন্বয় করার দাবী উত্তোলনের আগেই তারা ফতওয়া নিষিদ্ধের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠলো- আমরা ইসলামবিরোধী লেখা ও প্রকাশনা বন্ধের দাবীর আগেই তারা "জিহাদী বই" উদ্ধারের নাটক রপ্ত করে নিলো- আমরা স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে ইসলামি নীতির আলোকে সংস্কারের আওয়াজ তোলার আগেই তারা মাদ্রাসা সমূহের সংস্কারের নামে ইসলামি শিক্ষার মূল আবেদন উপড়ে ফেলার মিশনে নেমে পড়লো- আমরা তাদের উগ্র আধুনিকতাবাদী বলার আগেই তারা বলে ফেলল আমাদের পশ্চাদ্‌পদ।

পরাজিত সংখ্যাগরিষ্ঠ

এটা এক অদ্ভুত সংকট, যেখানে একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি পরাজিত হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু শ্রেণীর কাছে। সংখ্যালঘুর বুদ্ধি ও শঠতার কাছে হেরে যাচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের চেতনা ও আবেগ। যেমনটা আমরা হেরেছি অতি সংখ্যালঘু ইংরেজদের হাতে বাংলা পতনের মাধ্যমে। অথচ ইতিহাস বহন করে ভিন্ন নজির, যেখানে এটাই প্রমাণিত যে, সততা ও স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হবার ইসলামের মাধ্যমে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজাতিদের শাসন করেছে। কিন্তু সমকালে বৈশ্বিক পর্যায়ে আমরা পরাজিত হচ্ছি সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা শক্তি ও সভ্যতার কাছে আমাদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও। আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে আমরা পুনরায় হেরেছি সেক্যুলার সংখ্যালঘু অপশক্তির কাছে। বাংলাদেশের লক্ষ- লক্ষ ইসলামপন্থী আজ বেষ্টিত হয়ে গেছে স্বল্পসংখ্যক মিডিয়া ও সংস্কৃতিকর্মীর হাতে। ধূর্ত সংখ্যালঘু সেক্যুলার দুর্বৃত্তদের অব্যাহত ও পরিকল্পিত প্রচারণায় কুপোকাত হয়ে পড়ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চেতনার মিছিল। সংখ্যালঘু নারীবাদীরাই রাষ্ট্রকে তৈরি করে দিচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আদর্শবিরোধী নারী আইন ও নীতিমালা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী গুটি কয়েক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাষ্ট্রকে প্রণয়ন করে দিচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তা বিরোধী শিক্ষানীতি। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার ঐতিহ্য ও বিশ্বাসকে এড়িয়ে কতিপয় অর্বাচীন ও মুখোশধারী বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রবক্তা অংকন করে যাচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির মানচিত্র। সংখ্যালঘু পুঁজিবাদী বুর্জুয়া গোষ্ঠী নানা তরিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষকে শোষণ করে সম্পদের উন্মত্ত খেলায় মেতে আছে। আর যদি আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় ফিরে তাকানো হয় তাহলে দেখা যাবে সাম্রাজ্যবাদী মোড়লীপনার পিছনে সংখ্যালঘু ইহুদিবাদী নীতি নির্ধারকদের অদৃশ্য হাতের ছায়া। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিবিরে এহেন সংখ্যালঘু দুর্বৃত্তদের শক্তির উৎস কোথায়? নিশ্চয় তা হলো মিডিয়াসহ অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি তাদের প্রখর ও ধারাবাহিক চিন্তাশক্তি ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনার প্রয়াস।

এসো তারুণ্য! ঘুরে দাঁড়াই

মোটকথা, আমরা এখন এক কঠিনতম সন্ধিক্ষণে ------ এক বিপজ্জনক টার্নিং পয়েন্টে --------। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিবো, নাকি পাল্টা স্রোত সৃষ্টি করবো? আত্মসমর্পন করবো, নাকি পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবো?

আমরা কি
বিজয়ী হতে পারি?

ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ, আমরা বিজয়ী হতে পারি; এটা কোরআনেই আমাদের বলে দিয়েছে... হ্যাঁ আমরা বিজয়ী হতে পারি; কেননা আমাদের নবিজি (সা:) কোন পরাজয়ের মিশন নিয়ে আসেনি.... হ্যাঁ আমরা বিজয়ী হতে পারি। ইতিহাসের পরতে পরতে আমাদের পূর্বপুরুষগণ তা বারবার প্রমাণ করেছেন। হ্যাঁ আমরা বিজয়ী হতে পারি; যেহেতু আমরা আধুনিক সভ্যতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তার অন্ত সারশূণ্যতা প্রমাণ করতে পেরেছি... হ্যাঁ আমরা বিজয়ী হতে পারি এবং অবশ্যই বিজয়ী হতে পারি; যেহেতু মুসলিম দেশে দেশে সেক্যুলারিজমের ফরমুলা ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পেশীশক্তি ও আন্ত র্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদ সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আমাদের অঞ্চল সমূহে সামাজিকভাবে শেকড় গাড়তে পারেনি....

হ্যাঁ আমরা বিজয়ী হতে পারি; যেহেতু আমরা গত শতাব্দীতে 'কমিউনিজম কে তাত্ত্বিক ও সামরিকভাবে পরাজিত ও পরাভূত করেছি। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে নানা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের স্বাদ চুকিয়ে দিয়েছি... হ্যাঁ আমরা বিজয়ী হতে পারি; যেহেতু আরব বসন্তকে আমরা ইসলামি বসন্তে পরিণত করে দিয়েছি.... আমরা বিজয়ী হতে পারি; যেহেতু আল্লাহর গায়েবি সাহায্যের পাশাপাশি ভূ-তাত্ত্বিক বাস্তবতায় আমাদের শক্তির প্রধান অনুষঙ্গ হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চেতনা, যা তাওহীদ কনসেপ্ট ঘিরেই আন্দোলিত, উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত .... হ্যাঁ আমরা বিজয়ী হতে পারি; যেহেতু শত্রু-মিত্র তত্ত্বে বিশ্বাস করি আমরা ... হ্যাঁ আমরা বিজয়ী হতে পারি; যেহেতু অনেকগুলো ভবিষ্যতবাণীর

মাধ্যমে আমাদের প্রিয় নবিজি (সা.) আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন বিজয়ের মানচিত্র। আমরা সে মানচিত্র দেখে দেখে এগিয়ে যাচ্ছি... হ্যাঁ আমরা বিজয়ী হতে পারি। যেহেতু বিশ্বময় গড়ে উঠেছে আত্মবিশ্বাসী মুসলমানের এক বিজয়ী কাফেলা.... হ্যাঁ আমরা বিজয়ী হতে পারি; যেহেতু ঐ সব সুবিধাবাদী নীতি আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি, যার জোয়ারে ভেসে যেতে পারে কালিমার অঙ্গিকার .... হ্যাঁ আমরা বিজয়ী হতে পারি; যেহেতু মুনাফেকদের মুখোশ এখন উম্মোচিত হয়ে গেছে।

শুরুটা হবে
আকিদার মিম্বর থেকে

কোরআন- সর্বজনীন জীবন বিধান, শাশ্বত জীবন বিধান- এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করে মুসলিম-মানস থেকে সেক্যুলারিজম তিরোহিত করতে ----- শত্রু-মিত্র তত্ত্ব পুনঃজাগ্রত করে চলমান সংঘাতে ইসলামের পক্ষ ও বিপক্ষের মাঝে একটি পরিস্কার রেখা টেনে দিতে- ঈমান ও কুফরের মাপকাঠিতে জগত নির্মাণ করতে- প্রায়োগিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে জাহিলিয়্যাতের বিদায় ঘন্টা বাজাতে- শিক্ষা, আইন ও অর্থনীতির জায়গা থেকে ঈমান বিধ্বংসী উপাদান উপড়ে ফেলতে----- মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশকারী সকল 'আইডিওলোজি'কে পরাজিত করতে- আদর্শিক চেতনাবোধসম্পন্ন একটি জাতি গড়ে তুলতে---- আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ইসলামি নীতির আলোকে ঢেলে সাজাতে----- সাংস্কৃতিক জাহিলিয়্যাতের নিগড় থেকে জাতিকে বের করে আনতে--- আজ প্রধান কাজ হবে আকিদাকে সবচেয়ে বড় 'ফ্যাক্টর' হিসেবে গ্রহণ করা। আকীদার অস্পষ্ট অবস্থানকে স্বচ্ছতার উচ্চ শিখরে নিয়ে সকলের হাতে এমন আয়না তুলে দেওয়া যেখানে স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়বে জাহিলিয়্যাতি মুসলমানের প্রকৃত অবয়ব। তাওহিদের মিম্বর থেকে ঘোষণা করতে হবে আদর্শের এ লড়াই। আকিদার মিনার থেকেই আওয়াজ তুলতে হবে সর্বপ্রকার আধুনিক শির্ক ও জাহিলিয়্যাত বিরোধী আযান। কেননা চলমান বিচ্যুতি ও স্খলন নিছক কোন আমলগত ত্রুটি নয়; বরং এটি ঈমান এবং কুফরির প্রশ্ন। পুরো জাতি আজ দণ্ডায়মান হয়ে পড়েছে ঈমান ও কুফরির সীমানায়। প্রতিটি মুহূর্ত সেখানে স্পর্শকাতর। এটা বলা আজ মোটেও অত্যুক্তি হবে না যে,

সমাজের একটি বড় অংশ স্বঘোষিতভাবে নাস্তিক না হলেও অবচেতনে তাদের চিন্তা-চেতনায় 'মুরতাদ পাখি' বাসা বেঁধে আছে। আজ তাওহিদের পাঠ শানিত করলেই ধরা পড়বে সমাজের মনোজগতের কুফরিগুলো। সাধারণ মানুষ কেন? ইসলামি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা কি কম উদ্বেগজনক? জাহিলিয়্যাতের কুফরি কাঠামোর সঙ্গে সহাবস্থানের নীতি ও ঈমান-কুফরের সংঘাতে নীরবতা প্রদর্শন কি কুফরি সমতুল্য নয়? সুতরাং হে তরুণ! আকিদার জায়গা থেকে শুরু হোক তোমার যাত্রা।

সিরাতে রাসূল হতে হবে তারুণ্যের মডেল

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (سورة الاحزاب ٢١)

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসুলের মাঝে উত্তম আদর্শ, যারা আল্লাহ্ এবং পরকাল সম্পর্কে আশাবাদী"। (সূরা আহ্যাবঃ ২১)

ইসলামি তৎপরতা সমূহের সমকালীন নানা প্রয়াসগুলোর পর্যবেক্ষণে সিরাতে রাসুলের (সাঃ) অনুপস্থিতি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। পূর্বের আলোচনায় আমরা ইসলামি আন্দোলনসমূহের যে সকল আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করেছি তার কারণও এটা।

আসলে সিরাতে রাসুল (সাঃ) বলতে আমরা কী বুঝি? সিরাতে রাসুল (সাঃ) নিছক একজন মহৎ ব্যক্তির বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন জীবনালেখ্যের নাম নয়- এটি নয় কেবল অলৌকিকতাসর্বস্ব কতিপয় কাহিনীর নাম। অন্য নবীগণের ব্যাপারে হলেও আমাদের প্রিয় নবীজির ব্যাপারে এমনটা কল্পনা করা যায় না। সীরাত নিয়ে গভীর গবেষণা ও ব্যাপক পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট যে, আমাদের নবীজির সীরাত হলো পরিকল্পিত এক ধারাবাহিক সংগ্রামের নাম- যা বিশ্বের সবচেয়ে সফলতম বিপ্লবটি বয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলো। যে সংগ্রামের মৌলিক চরিত্র ছিলো প্রচ-আধ্যাত্মিক শক্তি, প্রখর মেধা থেকে নিঃসৃত দৃঢ় পরিকল্পনা, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সুস্পষ্ট কর্মসূচী, চিন্তার স্বচ্ছতা, আপোষহীন চেতনা,

বলিষ্ঠ প্রজ্ঞা ও কৌশল, আবেগ ও বুদ্ধির সমন্বয়, প্রকৃতির সবকটি উপাদানের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান, দরবেশি মন ও বাদশাহী চেতনা, যুদ্ধ ও শান্তির অভূতপূর্ব মিলন, দারিদ্র্য ও আর্থিক সমৃদ্ধির ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান। সর্বপ্রধান ব্যাপারটি ছিলো কোরআন কর্তৃক হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) মনন গড়া ও তার মানস গঠনে ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিক ভূমিকা পালন।

কোরআন আবার ফিরে
আসুক চেতনায়- প্রেরণায়-
বিপ্লবের বাঁশি নিয়ে

এসো হে তরুণ! আমরা ফিরে যাই কোরআনে- এসো ফিরে যাই একেকটি আয়াতের আলোকিত ভূমিতে। কোরআনের বাঁশি আমাদের কানে এমনভাবে বাজুক, যেন আজই আমাদের জন্যে, আমাদের প্রেক্ষাপটে এটি অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা কোরআনের একেকটি অংশ আরবী সুরে তেলাওয়াত করবো হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ দিয়ে। মনের পূর্ণ উত্তাপ নিয়ে। আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে কোরআনের কোন একটি অংশে, আর আমাদের মন ও মস্তিষ্ক সেখান থেকে সংগ্রহ করবে সমাজ পরিবর্তনের ছবিগুলো। তরুণ ! তুমি একেকটি আয়াতকে টার্গেট করো, আর তার সামনে থমকে দাড়াও চিন্তা ও গবেষণার বিশালতা নিয়ে। বাস্তবতার জগতে তাকে নিয়ে আসার প্রচন্ড স্পৃহা নিয়ে। তুমি কেবল একেকটি আয়াত পড়তে পড়তে চলছো না- বরং সমাজ বিপ্লবের সিঁড়িগুলো অতিক্রম করছো একেকটি করে।

তুমি যেন রেসালাতের প্রতিনিধিত্বের মশাল হাতে নিয়েছো। জিবরাঈলের কণ্ঠ যেন তুমি শুনতে পাচ্ছো। কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে একবার হারিয়ে যাও চৌদ্দশত বছর পূর্বের দিনগুলোতে। আবার হারিয়ে যাও সময়ের বর্তমানে। তুমি কোরআনের ভাষায় কথা বলতে শেখো- সংকটে সংঘাতে তুমি উদ্ধৃতি টানো কোরআনের। তুমি তোমার দাওয়াত আর কোরআনকে এক একান্ত করে নাও।

নবুওয়াতি দাওয়াতের মশাল
জ্বলে উঠুক তারুণ্যের ঈমানি ভ্রমণে

কী কার্যক্রম? কী কর্মসূচী। যা আহ্বানে সাড়াদানকারী কাতারবদ্ধ তারুণ্যকে আঞ্জাম দিতে হবে? কী হবে তার এজেন্ডা? যার বাস্তবায়নে সে মরণপণ শপথ নিবে? আঁধার রাতের মুসাফির কোন্ মশালটি ধারণ করে তার ভ্রমণের পথকে সুগম করবে?

আমরা যদি কোরআনে একটু নিমগ্ন হই- যদি মহানবীর সীরাতে একটুখানি ফিরে তাকাই- যদি আমরা ইতিহাসের সত্যপাঠে মনস্থ হই- আমরা যদি আমদানিকৃত ফরমুলার স্থলে ইসলামের সরল বৈপ্লবিক রূপরেখায় বিশ্বাসী হই তাহলে ইসলামের সংগ্রামী তারুণ্যের জন্য নবুওয়াতী দাওয়াতের এমন এক মশালের কথা বলতে পারি, যা প্রজ্জ্বলিত করে পৃথিবীতে ইসলাম নামের সবচেয়ে কার্যকর বিপ্লবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিলো।

দাওয়াত! কী মধুর একটি শব্দ! কী আবেদনময় একটি নাম! কী অর্থবহ একটি পরিভাষা! একটি শব্দ, যার মধ্যে অতি নৈপুণ্যের সাথে নিহিত রয়েছে সংগ্রাম, সংঘাত, সংলাপ, বিপ্লব, সংগঠন, প্রচারণা, আহ্বান, তথ্য, আলোচনা, যোগাযোগ, কূটনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, মিশনারি, পাঠশালা, প্রশিক্ষণ, ওয়াজ-নসিহত, মিশন, ভিশন ইত্যাদির মতো অসংখ্য অর্থ। সামাজিক পট পরিবর্তনের এমন বৈচিত্রময় সৌন্দর্যমণ্ডিত শব্দ উপস্থাপন কেবল ইসলাম ধর্মেরই মানায়।

কী মন, কী জড়, কী ব্যক্তি, কী সমষ্টি, কী পরিবার, কী সমাজ, কী রাষ্ট্র, কী বিশ্ব। সবখানেই তো দাওয়াতের আবেদন সমানভাবে সমাদৃত। বিপ্লবের উষ্ণতায়, শান্তির শীতলতায়, ক্ষমতার মধুচন্দ্রিমায়, নিষ্পেষণ নিগ্রহের তিক্ততায়, একাকিত্বের উন্নাসিকতায়, সরব মাহফিলের উৎফুল্লতায়, সবখানেই দাওয়াত জানান দিতে পারে তার অবস্থান।

ঈসা (আ.) এর মিশনারী, মুসা (আ.) এর সংগ্রাম, সুলাইমান (আ.) এর রাজত্ব, ইবরাহিম (আ.) এর বিশ্বভ্রমণ, লোকমান হিকমত, প্রিয় নবীজির (সাঃ) এর যুদ্ধ-জিহাদ সবকিছুই দাওয়াতের বৈচিত্র্যময় বহিঃপ্রকাশ। দাওয়াত কখনো নমরুদের তপ্ত আগুনের নিচে, কখনো নীলনদের পাড়ে, কখনো নুহ(আ.) এর কিশতির উপর, কখনো তূর পাহাড়ে, কখনো মে'রাজের ভ্রমণে- কত রকমারি চরিত্র আমরা লক্ষ্য

করি দাওয়াতের অভিনয়ে। দাওয়াত বেলালকে দাসত্বের শিকল থেকে কাবার প্রথম মুয়াজ্জিনের পদে আসীন করেছে। সে দাওয়াতই আবু জাহেলকে আরব নেতৃত্বের উচ্চতা থেকে বদর কূপের তলদেশে ছুঁড়ে ফেলেছে।

হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দাওয়াতী-এজেন্ডার সাথে অন্য কারো তুলনা হয় না। মাওসেতুং এর চীন বিপ্লব, লেলিন স্টালিনের রুশ বিপ্লব অথবা ইউরোপীয় রেনেসাঁর ফরাসি বিপ্লবের সাথে কিংবা আব্রাহাম লিংকনের রাষ্ট্র-চেতনা অথবা মহাত্মা গান্ধির কথিত অহিংস আন্দোলনের সাথে?

পরিতাপের বিষয়- সে দাওয়াতের স্থান দখল করে নিয়েছে কতিপয় অনুপ্রবেশকারী সংস্কৃতি ও কালচার। অন্তঃসারশূন্য লৌকিকতাপূর্ণ ঐ সব রেওয়াজগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে সমকালীন দাওয়াতের তাৎপর্য।

পরিতাপের বিষয়, সমকালীন অনুশীলনে দাওয়াতের বহুরূপী আবেদনকে পুরে দেয়া হয়েছে নিজ নিজ সংকীর্ণ মানসিকতার ছাঁচে।

পরিতাপের বিষয়, দাওয়াত ইসলামপন্থীদের প্রধান অগ্রাধিকার বিষয় নয়, এটা তাদের কারো কারো ইন্টারেস্টের বিষয়; অন্যতম প্রধান মিশন ও ভিশন হিসেবে নয়।

দাওয়াতি ধারাবাহিকতার চূড়ান্ত ধারাটির নাম হলো 'জিহাদ'। কোরআন ও সিরাতে রাসুল (সা.) অধ্যয়নে তা-ই প্রতীয়মান হয়। যদিও ইসলামি বিধানে নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এর মতো এটিও একটি, কিন্তু তা এমন এক ব্যতিক্রমী আমল যা ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিদিত।

বস্তুত, সমাজ বিপ্লবের প্রয়াসে সংঘাত একটি অপরিহার্য বিষয়। পৃথিবীর কোন বিপ্লব রক্তস্নাত পথ এড়িয়ে ফুলেল ও মসৃন পথ বেয়ে আসেনি। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও তার ব্যতিক্রম নাও হতে পারে। তবে সংঘাত কখনো লক্ষ্য ও কাম্য নয়।

দাওয়াত যখন চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছার প্রসব বেদনায় ছটফট করবে তখন এ জাগরণে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বিরুদ্ধবাদী শক্তি তা প্রতিহত করতে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। ইসলামী আন্দোলনের জন্য এ পর্বটি হবে চরম স্পর্শকাতর। প্রজ্ঞার সাথে তখন ঐ নতুন চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে হবে, এবং যৌক্তক আলোচনা ও সংলাপের সব পদ্ধতি ব্যবহার

করেও যদি বিরুদ্ধবাদী শক্তি আগ্রাসী কায়দায় ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরোধে বল প্রয়োগে খড়গহস্ত হয়, তাহলে দাওয়াতি আন্দোলনও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে।

সমকালের ইসলামি আন্দোলনগুলোর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হলো, সংঘাতের সমীকরণ; সরলীকরণের দ্বারা শত্রুদের মূল্যায়নে যেখানে কেবল রাজনৈতিক সমাধানকে মনে করা হয়েছে এটাই শুরু, এটাই শেষ। অথচ বিরুদ্ধবাদী শক্তি হিংস্র নখর দিয়ে ইসলামি আন্দোলনকে বারবার রক্তাক্ত করতে মোটেও কুণ্ঠিত হয়নি।

অন্যদিকে দাওয়াতের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতার পথ এড়িয়ে প্রজ্ঞাহীনভাবে কিছু অঞ্চলে সশস্ত্র কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যা স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন না করে বিচ্ছিন্ন কর্মকা-ের রূপ ধারণ করে। প্রথম শ্রেণীটি আন্দোলনে দাওয়াতি স্তরসমূহে জিহাদের পর্বকে বে-মালুম ভুলে গিয়ে কৌশলের নামে কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে- আর দ্বিতীয় শ্রেণীটি দাওয়াত বিবর্জিত জিহাদের মাধ্যমে হঠকারিতার স্বাক্ষর রেখেছে।

এক্ষেত্রে সংগ্রামী ইসলামী তারুণ্যের জন্য একটি নতুন চ্যালেঞ্জ হলো জিহাদের উপর সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের অভিযোগ আরোপ। এ চ্যালেঞ্জটিকেও মোকাবেলা করতে হবে জ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে।

জ্ঞান ও তাকওয়ার সমন্বিত গুণ ইসলামী তারুণ্যের চালিকাশক্তি

(ক) জ্ঞান:

ইল্ম ও হিকমাহ অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হবে সমকালীন বিপ্লবী সংস্কারবাদী ইসলামী তারুণ্যের প্রধান চালিকাশক্তি। তারুণ্যকে এ গুণটি তার পথচলায় প্রধান সম্বল ও উপকরণ হিসেবে ধারণ করতে হবে- কেননা কোরআন থেকে বুঝা যায়, জ্ঞানের গভীরতা থেকে উৎসারিত হয় বিশ্বাসী চেতনা (সুরা নিসা) কোরআন থেকে বুঝা যায়, জ্ঞানের আলোয় সিক্ত হৃদয় থেকেই উৎসারিত হয় তাওহীদের স্বাক্ষর। (সুরা আলে ইমরান) কোরআন থেকে বুঝা যায়, জ্ঞান থেকে উৎসারিত হয় এমন প্রচ- আধ্যাত্মিক শক্তি যা দানবের শক্তিকেও হার মানায়।

(সুরা নামাল) কোরআন থেকে বুঝা যায়, জ্ঞানের ঝরনাধারা থেকে উৎসারিত হয় সশ্রদ্ধ আল্লাহভীতি। (সুরা ফাতির)

আর দাওয়াতের মিশন রাসুলের (সা.) হাতে ধরিয়ে দিয়ে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন- "রাব্বি জিদ্‌নী ইল্‌মা।

এ জ্ঞানকে কোরআনে বারবার ইল্‌ম শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছে, তার বিপরীতে কোরআন ব্যবহার করেছে, 'জন্ন' শব্দটি, যার মানে অনুমানভিত্তিক জানা। অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা কিংবা দার্শনিক তত্ত্বকথা সমূহের নাম কিন্তু ইল্‌ম নয়। ইল্‌ম হলো এক বাস্তবিক জ্ঞান, যার ভিত্তি ওহির উপর, মানবমস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তার উপর নয়। আজ তাবৎ পৃথিবীর দর্শনের সকল পান্ডুলিপি একত্রিত করলে ফলাফল দাঁড়াবে মানব মন থেকে উদগিরিত কতক দ্বন্দ্বকথা। তার চেয়ে বরং বিজ্ঞানের পরিক্ষিত বিষয়গুলো অনেকটা ওহির জ্ঞানের কাছাকাছি। কিন্তু সমস্যা হলো, বিজ্ঞান মানব জীবনের সব দিকগুলোর সন্তোষ বিধানে কোন সামগ্রিক ব্যবস্থা দিতে পারেনি।

সমকালীন বস্তুবাদী আধুনিক ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে তার অন্যতম উপকরণ বৈজ্ঞানিক দিকটির সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে- শিক্ষা ও জ্ঞান ছাড়া যা সম্ভব নয়। তার প্রধান উৎস অর্থাৎ বস্তুবাদী লিবাসের চেতনার গোড়ায় দার্শনিক ও যৌক্তিক ভাষায় আঘাত হানতে হবে- শিক্ষা ও জ্ঞান ছাড়া যা সম্ভব নয়। তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ব্যর্থতা তুলে ধরে তার অসারতা প্রমাণ করতে হবে- শিক্ষা ও জ্ঞান ছাড়া যা সম্ভব নয়। তার আগ্রাসি সামরিক কৌশলের বিরুদ্ধে পাল্টা সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে- জ্ঞান ও শিক্ষা ছাড়া যা সম্ভব নয়। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিতে হবে শানিত যুক্তির ভাষায়- জ্ঞান ও শিক্ষা ছাড়া যা সম্ভব নয়।

সর্বগ্রাসী আধুনিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা তখনই অর্থবহ হবে; যখন আমরা একটা পাল্টা বিকল্প দাঁড় করাতে পারবো। সেজন্য কী পরিমাণ মেধা ও যোগ্যতার প্রয়োজন তা বলা বাহুল্য। মোকাবেলার নানাবিধ প্রক্রিয়াগুলোর মাঝে কোনটি স্থান-কালের বাস্তবতায় অগ্রাধিকার পাবে- তা নির্ণয়েও প্রয়োজন যথাযথ জ্ঞানের। আর জীবন চ্যালেঞ্জের ঐ সব দিক অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক দিকগুলো সম-পদ্ধতির কাউন্টার উদ্যোগগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করার ব্যাপারটিও সঠিক জ্ঞান ও পর্যাপ্ত প্রজ্ঞা ছাড়া সম্ভবপর নয়।

এ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দরকার প্রচলিত ইসলামি ধারাসমূহের আভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রয়াসের বেলায়ও। মোটকথা, আজকের লড়াই বহুধা ফ্রন্টে বিস্তৃত। জ্ঞানের শক্তি দ্বারা এ বহুমুখী যুদ্ধে বিজয়ের ম্যাপ তৈরি করতে হবে সমকালীন ইসলামি তারুণ্যকে।

(খ) তাক্বওয়াঃ

ইসলামের সংগ্রামী দাওয়াতের পতাকাবাহীদের অবশ্যই দুটি বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে। এক: "আলোকিত চিন্তা"- এতক্ষণ আমরা যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোচনা করেছি তারই সাথে সম্পৃক্ত এ বিবরণ।
দুইঃ "অন্তর্দৃষ্টি"। পৃথিবীতে সবকিছু কেবল বাহ্যিক জ্ঞান ও শিক্ষা দ্বারা এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমেই অর্জিত হয়নি। এ সবের মাধ্যমে একটি সুন্দর পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা যায়, কিন্তু তার চূড়ান্ত পরিণাম কতটুকু শুভ হবে তা অনুধাবন করা যায় না। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি এমন এক জিনিস যা ভবিষ্যতের প্রকৃত কল্যাণ-অকল্যাণের অনেক গায়েবি সত্যের ছবি মানুষের হৃদয় পটে তুলে ধরে। অন্য ভাষায় এটাকে বলা হয় ইমানদারের মনের সাক্ষী। হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, "মুমিনের বিচক্ষণতাকে সমীহ করো, কেননা সে আল্লাহ প্রদত্ত আলো দ্বারা দেখতে পায়।" তাকওয়ার মাধ্যমেই কেবল এ গুণটি অর্জন করা সম্ভব। তাকওয়া মানে কি? আল্লামা জুরজানির ভাষায় "কিছু কাজ করা আর কিছু কাজ পরিহারের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করা।"
ইতিহাসের নানা পরতে এমন সব নজিরের অভাব নেই, যেখানে দেখা যায় ইসলামি তৎপরতা গুলোর ব্যর্থতার নেপথ্যে ছিলো তাক্বওয়ার অনুপস্থিতি। কেননা আন্দোলনের সাফল্য এবং যুদ্ধে জয়লাভ অনেকাংশে নির্ভর করে মনস্তাত্ত্বিক শক্তি ও নৈতিক মনোবলের উপরে, যা তাক্বওয়া ব্যতীত কল্পনা করা যায় না। তাকওয়ার অনুশীলনে পারিপার্শ্বিক জড়তার দরুন মন কলুষিত হতে পারে না। তাক্বওয়ার উপস্থিতিতে কু-প্রবৃত্তিগুলো সচল হতে পারেনা। যে তারুণ্যের মন আজ জড়বাদী জীবনের দাসত্বে আবদ্ধ রয়েছে সে তো যুদ্ধে হারার আগেই হেরে গেলো! বহিঃশক্তির হামলা প্রতিরোধের আগেই অন্তরযুদ্ধে যেন কুপোকাত হয়ে গেলো।

সংগঠন :
ইসলামি তারুণ্যের প্রধান দুর্গ

ইসলাম তার শিক্ষায় আমাদেরকে সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থার দর্শন পেশ করে। নামায থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত সবখানে সংগঠিত কর্মধারার একটি পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি আমরা সহজেই লক্ষ্য করি ইসলামি বিধানে। ভ্রমণের মত একটি নগণ্য বিষয়েও জামাতবদ্ধতার বিপরীত একজন দুজনকে বলা হয়েছে শয়তানের সহচর। যুদ্ধের ময়দানে সাহাবাদের বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান মহানবী (সা.) পছন্দ করেন নি। বলা হয়েছে, আল্লাহর (সাহায্য ও করুণার) হাত জামাতের উপর প্রসারিত। সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরামের জামাতের ন্যায় এত ব্যাপক ও সফল সংগঠনের নজির আর নেই।

মুসলিম সমাজের অনেক বড় বড় ব্যক্তিবর্গ এমনকি মনীষী তুল্য ব্যক্তিত্বকে দেখা যায়, ইসলামি এজেন্ডা বাস্তবায়নে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার স্থলে ব্যক্তিগত প্রয়াসের প্রতি আগ্রহী। সংগঠনগুলোর ত্রুটিপূর্ণ কার্যক্রমের কারণে এমনটা হলে সমস্যা নেই, কিন্তু একান্তই নিজস্ব অভিরুচির কারণে তা হয়ে থাকলে ইসলাম সেটাকে সমর্থন করেনা। কেননা, ইসলাম যে একটি সামষ্টিক দাওয়াতি ও বিপ্লবী এজেন্ডার নাম তা বলা বাহুল্য।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সমাজের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বগণ সংগঠনগুলোর নেতিবাচক দিকগুলোর কারণে হতাশ হয়ে অথবা যে কোন কারণে বর্জনের নীতি গ্রহণ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগের দিকে যদি ধাবিত হয়ে পড়েন তাহলে তা মুসলিম সমাজের সংকটকে কি আরো প্রকট করে তুলবে না? এ ক্ষেত্রে ঐ সব ব্যক্তিত্বগণের কর্তব্য হলো বর্জনের স্থলে 'নসীহা' ও 'ইসলাহ' এর নীতি গ্রহণ করা এবং 'সবর' এর গুণ ধারণ করা, যা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে অনেক বেশি ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে।

তবে সংগঠন বলতে কী বুঝায়? সংগঠন বলতে আমরা মনে করি ইসলামি দাওয়াতের বৈপ্লবিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। আর সে মানদন্ডে বৈপ্লবিক দাওয়াতের চেতনা বিবর্জিত ইসলামের নামে পরিচালিত নিছক সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সমূহ যেমনঃ মাদরাসা, খানকা, পাঠাগার, দাতব্য সংস্থা, আমাদের সংজ্ঞায় কেবল ঐ সময় সংগঠন বলে আখ্যায়িত করতে পারি, যখন এগুলোতে ইসলামের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করা হবে। তবে এটাও অনস্বীকার্য যে এরূপ সংগঠন বলতে রাজনীতির বাজারে প্রচলিত দলাদলিকে বুঝায় না। ইসলামি আন্দোলনের মহৎ লক্ষ্যে দলগঠন ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা খুবই

গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার তাৎপর্য বর্তমান বিপন্ন হয়েছে অনৈক্যের কারণে সৃষ্ট দলবাজির সংস্কৃতির কারণে।

আসলে যে সংগঠনের কথাটি আমরা বলছি, তার চেয়েও মৌলিক হলো 'ইমারাহ', বা নেতৃত্বের বিষয়টি। নেতৃত্বকে কেন্দ্র করেই স্বাভাবিক পন্থায় তৈরি হয় সংগঠনের বলয়। নেতৃত্বের বৃত্তকে ঘিরে আবর্তিত হয় সামষ্টিক চাকা। এটাই বাস্তবতা ও এটাই ইসলামে কাম্য। নেতৃত্ব থেকেই জন্ম নেয় সংগঠন, এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম হলেও এখন দেখা যাচ্ছে এক উদ্ভট পদ্ধতি, যেখানে নেতৃত্বকে পরিণত হতে দেখা যায় সংগঠনের ক্রীড়নকে। মুসলিম উম্মাহ; যে সংকটের আবর্তে ঘূর্ণায়মান, তা থেকে মুক্তির প্রধানতম সমাধানটি নিহিত রয়েছে ইমারাহ বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্যে।

বর্তমান বাস্তবতায় মুসলিম সমাজে নেতৃত্বের যে বেহাল দশা, তা আমাদেরকে জোরালোভাবে নির্দেশ করে শক্তিশালী সাংগঠনিক ধারাকে নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে মেনে নেওয়ার দিকে। বস্তুত একটি মজবুত সংগঠন একজন সক্রিয় কর্মীর জন্য সৈনিকের দুর্গ সমতুল্য।

সংগঠন হলো ইসলামি তারুণ্যের সংগ্রামী যাত্রার মধ্যবর্তী ধাপ, যা বিপ্লবের প্রাথমিক চেতনা ও পরবর্তী চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মাঝে একটি সেতুবন্ধন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট; যা দাওয়াতি কর্মীকে চেতনার শিকড় থেকে লক্ষ্যের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। সংগঠন জরুরি, তবে তার আগে দরকার একটি পরিপূর্ণ চিন্তা ও পরিশুদ্ধ চেতনা। বর্তমান ইসলামী তারুণ্যের আপদ হলো পাকাপোক্ত চিন্তার আগেই সাংগঠনিক আনুষ্ঠানিকতার বেড়াজালে নিজেদের আটকে ফেলে বিপ্লবের মূল টার্গেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া।

কিন্তু নতুন করে আবার প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে যে, রকমারী দলের আধিক্যের মাঝে কোন্ দলের ছায়ায় সংগঠিত হবে তারুণ্য? যদি দলগুলো সালফে সালেহীন অনুসৃত আক্বিদাহ পোষণ করে, যদি সেগুলো তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য দ্বারা ম-িত হয়- যদি সেগুলো বিদ্বেষের মানসিকতা পরিহার করে সমন্বয়ের নীতি গ্রহণ করে পরস্পরের জন্য সম্পূরকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়- যদি খ-িত ইসলামের স্থলে ইসলামের বহুমুখী চেতনা লালন করে- যদি সেগুলো মোহাসাবা বা আত্মসমালোচনার মাপকাঠিতে পরিচালিত হয়। তাহলে সমকালীন ইসলামী তারুণ্যের জন্য ফরজ হলো কোন একটি সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজের ঈমানী চেতনার বাস্তবায়নে সংঘবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণ করে বৃহত্তর ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া এবং সাথে সাথে

উচিৎ হলো, অপরাপর দল ও সংগঠনগুলোর সাথে ঐক্য ও সমন্বয়ের নীতির আলোকে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। ইসলামী তারুণ্যকে মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে কোন দল, সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান ইসলামের সার্বিক চেতনার পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম নয়। কাজের বাস্তবতায় সীমাবদ্ধতা দোষের নয়, কিন্তু চিন্তা ও চেতনার জগতে সে সীমাবদ্ধতা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ইসলামী তারুণ্যকে এ বিষয়টি মস্তিষ্কে ধারণ করেই যে কোন সংঘবদ্ধ প্রয়াসের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।

ইসলামি রেনেসাঁ নানা সংগঠনের যোগাযোগ ও সমন্বয়ের প্লাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। এ রেনেসাঁর সূচনায় নির্দলীয় কিছু লোককে নতুন চেতনার পতাকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

ইমারাহ'র অবর্তমানে ইখতিলাফের সমাধান হবে সমন্বয়

ইসলামের সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও বৈপ্লবিক চিন্তায় ইমারাহর বিষয়টি সর্বপ্রধান অনুষঙ্গ একথা বলা বাহুল্য। আজ সকলের মুখে মুখে প্রকাশ পায় মুসলমানদের অনৈক্যের কথা। তার জন্য প্রত্যেকেই কতই না হা-হুতাশ করে। ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা আজ কে না বলে? কিন্তু ঐক্য শব্দটি কতটুকু মৌলিক, যে ঐক্যের কথা বলা হচ্ছে তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার চেয়েও মৌলিক হলো ইমারাহর বিষয়টি। যেমনটা আমরা সংগঠনের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। ইসলাম কেবল ঐক্যের মহত্ত্ব ও অনৈক্যের নিন্দায় বয়ান তুলে ধরেছে তা শুধু নয়। বরং নেতৃত্বের আনুগত্যের প্রতি জোরালো তাগিদের মাধ্যমে অনৈক্যের একটি বাস্তবসম্মত ও তাৎপর্যপূর্ণ সমাধান পেশ করেছে। মুসলিম সমাজে নিরংকুশ নেতৃত্বের বিষয়টি এ যাবৎ সুদূর পরাহত হওয়ায় কী হতে পারে তার বিকল্প, ঐক্য শব্দ দ্বারা যে বিকল্প আমরা চিন্তা করি, সে ঐক্য শব্দটি নেহায়েত একটি এজমালি শব্দ, যার স্বচ্ছ কোন রূপরেখা নেই, নেই তার কোন সংজ্ঞা। নেই তার কোন নিয়ম ও বিধি। আর তা-ই এখানে ব্যবহার করছি সমন্বয়ের মত শব্দ। অর্থাৎ সমন্বয় হবে আমাদের পদ্ধতি আর ঐক্য হবে উদ্দেশ্য। ঐক্য একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ বিষয় যা কোন কর্মপদ্ধতি হতে পারে না।

আমাদের মূলনীতি:

১. এটি প্রচলিত অর্থে গতানুগতিক কোন দল নয়। বরং একটি এমন উন্মুক্ত প্লাটফর্ম; যা ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে চলমান সকল ইসলামী ধারাগুলোর সাথে সমন্বয়ের নীতি অবলম্বন করবে। সমাজ বিপ্লবের একমুখী লক্ষ্য স্থিরকরনে এ সংস্থা সেতুবন্ধনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

২. এ সংস্থার মূখ্য চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য হলো আপোষহীন আদর্শিক দাওয়াতী চেতনা যেখানে সুবিধাবাদী নীতি অগ্রাহ্য হবে এবং কায়েমী স্বার্থবাদ অবিবেচিত হবে।

৩. এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস যা আধুনিক দান্দ্বিকতার সংকট ও ব্যর্থতা তুলে ধরে প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষায় একুশ শতকে ইসলামী এজেন্ডার শ্রেষ্ঠত্বের বয়ান উপস্থাপন করবে। এ হিসাবে এ সংস্থা আংশিকভাবে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

৪. এটি একটি সংস্কারবাদী কার্যক্রম, যা আধুনিক জাহিলিয়্যাতের মূল্যবোধের মোকাবেলায় ইসলামের নির্ভেজাল চেতনাকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হবে এবং ইসলামী তৎপরতা সমূহের মধ্যে দূর্বলতার উপাদানসমূহ চিহ্নিত করে বিশুদ্ধ পর্যবেক্ষণ প্রদান করবে।

৫. সংস্কারবাদী চেতনা বাস্তবায়নে সামাজিক, রাজনৈতিক, সর্বক্ষেত্রে ইসলামের নসীহা, তথা "আমার বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারে"র নীতি অবলম্বন করবে।

৬. ইসলামি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এ সংস্থার সম্পর্কের মৌলিক ভিত্তি হবে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের উপর। ইখতিলাফের ক্ষেত্রগুলোতে সমালোচনামূলক তর্ক-বিতর্ক ও আক্রমণাত্মক ভূমিকার স্থলে ইতিবাচক পন্থায় নসিহা ও ইসলাহের নীতি গ্রহণ করবে।

৭. সংস্থা ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী হলেও গতানুগতিক ক্ষমতামুখী প্রবণতা এড়িয়ে যাবে। তবে উপরোল্লিখিত নীতি সমূহের আলোকে তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়ন করবে।

৮. তারুণ্যকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দাওয়াতের কাজে সম্পৃক্তকরণ সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য হবে।

৯. এ সংস্থা একটি প্রকাশ্য মিশন; যা সরকারি বেসরকারি প্রভাবশালী মহলে ইতিবাচক ও গঠনমূলক দাওয়াতি তৎপরতা গ্রহণ করতে সচেষ্ট থাকবে।

১০. দাওয়াতের যথাযথ প্রতিফলনে এ সংস্থা অত্যাধুনিক সকল উপকরণ ও কলাকৌশল প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত হবে।

১১. বৈশ্বিক রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্থার নীতি হলো নিপীড়িত মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রামের জিহাদকে সমর্থন এবং পাশাপাশি অমুসলিম সরকার ও সংস্থাগুলোর সাথে অব্যাহত যোগাযোগের মাধ্যমে দাওয়াতি ও রাজনৈতিক সংলাপ চালিয়ে যাওয়া।

সমাপ্ত